بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৪ অক্টোবর, ২০২৫ মোতাবেক ২৪ ইখা, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজও আমি তাবুকের যুদ্ধের ঘটনাবলির আরো বিস্তারিত বিবরণ দেবো। একজন ব্যক্তি, জাদ বিন কায়সের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেও মুনাফিকদের মধ্যে একজন ছিল, যে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর পরে মুনাফিকদের দ্বিতীয় বড়ো নেতা ছিল। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর সাথে মিলে সে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। এ-ই সেই ব্যক্তি যে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ও বয়আত করে নি। সেও আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে না যাবার জন্য ওজর-অজুহাত পেশ করেছিল, কিন্তু এই ওজরটিও ছিল এক অদ্ভুত, হাস্যকর, বিশ্রী ওজর। বর্ণিত আছে, তাবুকের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) বনু সালামার সর্দার জাদ বিন কায়েসকে বলেন, হে জাদ! তুমি কি এই বছর বনু আসফার অর্থাৎ রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে যাবে? সে বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। আল্লাহ্র কসম! আমার গোত্র আমার সম্পর্কে ভালো করেই জানে, আমার চেয়ে বেশি আর কেউ নারীতে আসক্ত নয়। আর আমার ভয় হয়, যদি আমি বনু আসফার অর্থাৎ রোমানদের নারীদের দেখে ফেলি, তাহলে আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারব না। এই অর্থহীন উত্তর শুনে মহানবী (সা.) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, ঠিক আছে, যাও! তোমার অনুমতি আছে, তোমার যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তার ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদ, যিনি খুবই নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবী ছিলেন– নিজ পিতার কাছে আসেন এবং বলেন, আপনি মহানবী (সা.)-এর আহ্বান কেন প্রত্যাখ্যান করেছেন? আল্লাহ্র কসম! বনু সালামাতে আপনার চেয়ে ধনী আর কেউ নেই। আপনি নিজেও বের হচ্ছেন না এবং কাউকে বাহনও দিচ্ছেন না; অর্থাৎ কোনো মুজাহিদের জন্য বাহন ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করছেন না। সে উত্তরে ছেলেকে বলে, হে আমার পুত্র! আমার কী হয়েছে যে, আমি এই গরম এবং অভাব-অনটনের সময়ে বনু আসফারের উদ্দেশ্যে বের হব? হে আমার পুত্র! আমি আমার ঘরে এবং আমার এলাকায় থাকা অবস্থাতেই রোমানদের ভয়ে কাঁপছি। সুতরাং এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমি তাদের এলাকায় কীভাবে যেতে পারি? আমি তো ঘরে বসেই ভীত। হে পুত্র! আল্লাহ্র কসম, আমি একজন বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ মানুষ। যুদ্ধ সম্পর্কে আমার বেশ ভালো অভিজ্ঞতা আছে। অর্থাৎ সে বলতে চাইছিল, পরাশক্তি রোমের সাথে যুদ্ধ করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই সব কথা শুনে তার নিষ্ঠাবান পুত্র রেগে যান এবং বলেন, না, আল্লাহ্র কসম! এটা কপটতা, যার কারণে আপনি যুদ্ধে যাচ্ছেন না। আল্লাহ্র কসম! আপনার সম্পর্কে অবশ্যই আল্লাহ্র রসূলের প্রতি কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে। বলা হয়, তখন তার বাবা তার জুতো তুলে তার মুখে ছুঁড়ে মারে। তার ছেলে তখন ফিরে যায় এবং তার সাথে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, জাদ বিন কায়েসের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যে,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي অর্থাৎ, আর তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যে বলে, 'আমাকে অনুমতি দিন এবং আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না'।

বলা হয়ে থাকে, পরবর্তী সময়ে সে তওবা করেছিল এবং আন্তরিকভাবে তওবা করেছিল আর হযরত উসমানের খিলাফতকালে ইন্তেকাল করে। পরে তার মধ্যে এই কপটতা আর থাকে নি, বরং সে নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা একস্থানে সমবেত হয়ে সেখানে যুদ্ধের বিষয়ে ষড়যন্ত্র করত। এর বিবরণ পূর্বেও কিছুটা দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ তারা তাদের একটি কেন্দ্র তৈরি করে রেখেছিল। মহানবী (সা.) এই কেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে, মদীনায় মুনাফিক ও ইহুদীরা এসব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, অর্থাৎ মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে মুসলমানদের মনোবল দুর্বল করা, মুসলমানদের যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং এ উদ্দেশ্যে তারা নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করত। নিবেদিতপ্রাণ এবং দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মু'মিনরা মুনাফিকদের এই ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শুধু অবগতই ছিলেন না, বরং তাদের ওপর দৃষ্টি রাখতেন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে এই লোকদের রিপোর্টও পৌঁছত। যদিও মহানবী (সা.) তাঁর দয়া ও সহানুভূতির কারণে এই লোকদের ক্ষমা করে দিতেন, কিন্তু যখন (রাষ্ট্রীয়) ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোনো বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র হতো, তখন তা অত্যন্ত বিচক্ষণতা, তবে কঠোরতার সাথে দমন করার জন্য ব্যবস্থাও নেওয়া হতো। এই মৌলিক নীতিটি মনে রাখা উচিত, ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা হয়, তবে কঠোরতাও করা হয়; সেখানে নমনীয়তার প্রশ্নই থাকে না। যেমন এ ধরনের একটি পদক্ষেপ তখনও নেওয়া হয়েছিল। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর কাছে খবর পৌঁছায় যে, মুনাফিকরা সুয়াইলাম নামক ইহুদীর বাড়িতে একত্রিত হচ্ছে, যার বাড়ি জাসূমের কাছে অবস্থিত; [এটিকে বিরে জাসেমও বলা হয়, এটি মদীনার একটি কুয়ো ছিল;] আর মুনাফিকরা লোকজনকে তাবুকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যাওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছে। মূলত, মদীনায় মুসলমানদের এই যুদ্ধে না যাবার জন্য সব ধরনের নেতিবাচক ষড়যন্ত্র এখানেই করা হতো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌কে কিছু লোকের সাথে সেখানে পাঠান এবং নির্দেশ দেন, সুয়াইলামের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হোক; অর্থাৎ এটিকে গুঁড়িয়ে দাও, ধ্বংস করে দাও এবং জ্বালিয়ে দাও। সেই যুগে কাঁচা ঘর হতো। হযরত তালহা তা-ই করেন, তখন সেই জায়গায় উপস্থিত সমস্ত লোক পালিয়ে যায়। এই পালিয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে একজন ছিল যাহহাক বিন খলীফা, যে মুনাফিকদের সাথে ছিল। সে ঘরের ছাদে উঠে যায় এবং তার পিছনের দিক থেকে নীচে লাফ দেয়, যার কারণে তার পা এবং কবজি ভেঙে যায়। মহানবী (সা.)-এর দয়া ও ক্ষমা তখনও এমনভাবে প্রাধান্য পায় যে, তিনি (সা.) তাদের কাউকেই গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন নি এবং কোনো অতিরিক্ত শাস্তিও দেন নি, তবে ষড়যন্ত্রের এই আড্ডাখানা, অর্থাৎ প্রধান কার্যালয়কে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

তাবুকের সফরের জন্য প্রত্যেকেই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। আর্থিক কুরবানীর (ত্যাগের) ধারাও চলমান ছিল যেন সফরের ব্যয়ভারের ব্যবস্থা হতে পারে। গরিব ও অভাবী সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হতেন, তখন প্রস্তুতির জন্য তাদের সাহায্য করা হতো। একইভাবে সম্পদশালী লোকেরা সেই সাহাবীদেরকেও বাহন ইত্যাদি সরবরাহ করছিলেন যাদের কাছে বাহন ছিল না, কারণ বাহন ছাড়া এই সফর করা সম্ভব ছিল না। আর মহানবী (সা.)-এরও নির্দেশ ছিল, আমাদের সাথে সেই ব্যক্তিই যাবে যে দৈহিকভাবে শক্তিশালী হবে

আর সফরের কষ্ট সহ্য করতে পারবে এবং তার কাছে বাহন ও পাথেয় থাকতে হবে। এই সময়ে কিছু সাহাবী কাঁদতে কাঁদতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তারা তাঁর (সা.) কাছে বাহনের জন্য অনুরোধ করেন এবং তারা এর মুখাপেক্ষীও ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমার কাছে তো এখন তোমাদেরকে বাহন হিসেবে দেবার মতো কিছুই নেই। এই কথা শুনে তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যান। এই সাহাবীদের নিষ্ঠা, আনুগত্য এবং অসহায়ত্বের এই অবস্থার বর্ণনা আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এভাবে দিয়েছেন:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ

(সূরা তাওবা: ৯২)

অর্থাৎ, আর সেই লোকদের ওপরও কোনো অভিযোগ নেই যারা তোমার কাছে এসেছিল যখন যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছিল, যেন তুমি তাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা করে দাও। তখন তুমি উত্তর দিয়েছিলে, 'আমার কাছে এমন কোনো জিনিস নেই যার ওপর তোমাদের আরোহণ করাবো'; আর এই উত্তর শুনে তারা ফিরে যায় এবং এই দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল যে, হায়! তাদের কাছে এমন কিছু নেই যা তারা আল্লাহ্র পথে খরচ করতে পারে।

এটি সূরা তওবার আয়াত। তাদের এই অনটন ও অনেক বেশি কান্নাকাটির কারণে ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে তাদেরকে 'বুকাউন' নামে স্মরণ করা হয়; অর্থাৎ, অধিক ক্রন্দনকারী। তাদের সংখ্যার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় পুস্তকে প্রায় আঠারোজনের নাম পাওয়া যায়। তবে সাতজনের নামের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। এতে সালেম বিন উমায়ের, উরওয়া বিন যায়েদ, আবু লায়লা আব্দুর রহমান বিন কা'ব, আমর বিন হুমাম, আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফফাল মুযানী, হারমি বিন আব্দুল্লাহ্ এবং ইরবায বিন সারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। একটি রেওয়াতে রয়েছে ইয়ামিন বিন উমায়ের বিন কা'ব নাযারীরও হযরত আবু লায়লা আব্দুর রহমান বিন কা'ব এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফফালের (রা.) সাথে পথে সাক্ষাৎ হয়। এই দুইজন কাঁদছিলেন। তিনি এই দুইজনকে জিজ্ঞেস করেন, কেন কাঁদছ? তারা বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গিয়েছিলাম যেন তিনি আমাদের বাহন দান করেন, কিন্তু সেখানেও আমরা কোনো বাহন পাই নি। আমাদের কাছে এত ধনসম্পদ নেই যে, বাহনের ব্যবস্থা করে তাঁর (সা.) সাথে জিহাদে যোগ দেবো। এতে তিনি তাদেরকে একটি পানি বহনকারী উট দেন; তারা দুইজন এর ওপর জিন চাপান। এছাড়াও তিনি পাথেয় হিসেবে তাদের কিছু খেজুরও দেন। এভাবে এই দুইজন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে জিহাদে অংশ নেবার জন্য রওয়ানা হন; এভাবে তাদের ব্যবস্থা হয়েছে। একইভাবে হযরত আব্বাস (রা.) যখন জানতে পারেন তখন তিনিও দুইজন সাহাবীকে বাহন ও পাথেয় সরবরাহ করেন। অবশিষ্ট তিনজনকে হযরত উসমান (রা.) বাহন ও পাথেয় দেন। এভাবে এই সাতজন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে রওয়ানা হন।

একইভাবে হযরত আবু মূসা আশআরীর (রা.) গোত্রের লোকেরাও মহানবী (সা.)-এর কাছে বাহনের আবেদন করেন। তারা ছয়জন ছিলেন। তারা হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে প্রতিনিধি বানিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠান। তাকেও মহানবী (সা.) এ কথাই বলেন যে, আমার কাছে তোমাদেরকে দেবার মতো কিছু নেই। বুখারীর রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি (সা.) কসম খেয়ে বলেন, আমার কাছে দেবার মতো কিছুই নেই। এতে সেসব লোক সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়। কিন্তু এরই মাঝে তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদার (রা.) কাছ থেকে উট ক্রয় করেন এবং হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে

ডেকে পাঠান ও বলেন, এই উটগুলো নিয়ে যাও এবং তুমি নিজে নাও ও তোমার সঙ্গীদের দাও। এই ঘটনার বিস্তারিত হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। বুখারীতে রয়েছে, হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, আশআর গোত্রের কিছুর লোকের সাথে আমি বাহন চাইতে মহানবী (সা.)-এর নিকট যাই। তিনি (সা.) বলেন, খোদার কসম! আমি তোমাদের বাহন দেবো না। আমার কাছে তোমাদের দেবার মতো বাহনের কোনো পশু নেই। এরই মাঝে তাঁর (সা.) কাছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উট আনা হলো। তিনি (সা.) আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন আর বললেন, আশআরী গোত্রের লোকেরা কোথায়? তিনি (সা.) পাঁচটি সাদা কুঁজ বিশিষ্ট উট আমাদেরকে দিতে নির্দেশ দেন। আমরা ফিরে গিয়ে বলাবলি করছিলাম, আমরা যা করেছি তা আমাদের জন্য কখনোই কল্যাণজনক হবে না। আমরা এটা চিন্তা করে তাঁর (সা.) কাছে ফেরত যাই এবং বলি, আমরা আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম যে, আমাদেরকে বাহন দিন; আর আপনি শপথ করেছিলেন, আপনি আমাদেরকে বাহন দেবেন না। আপনি কি ভুলে গেছেন যে, আপনি কসম খেয়ে বলেছেন– আমাদেরকে বাহন দেবেন না। তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে বাহন দেই নি বরং আল্লাহ্ তোমাদের বাহন দিয়েছেন। আমি যদি কোনো বিষয়ে শপথ করেও থাকি, এরপর যদি এর ভিন্ন কোনো বিষয় উত্তম মনে করি, তাহলে ইনশাল্লাহ্ সেটাই করব যা উত্তম হবে এবং এই কসমের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করব।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি বলেন, আমার সঙ্গীরা আমাকে বাহন চাইবার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে আমাকে পাঠায়, কেননা তারাও তাঁর (সা.) সাথে জায়শুল উসরায় যেতে চায়, অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধে যেতে চায়। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী (সা.)! আমার সঙ্গীরা আমাকে আপনার কাছে বাহন চাইবার জন্য পাঠিয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের দেবার মতো কোনো বাহন নেই। ঘটনাচক্রে আমি এমন সময় তাঁর (সা.) কাছে চেয়েছিলাম যখন তিনি (সা.) কিছুটা রাগান্বিত ছিলেন আর আমি এটি জানতাম না। আমি মহানবী (সা.)-এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে এবং মহানবী (সা.) হয়ত আমার ওপর অসন্তুষ্ট– এই আশঙ্কায় কিছুটা দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে ফেরত আসি। আমি আমার সঙ্গীদের কাছে ফেরত চলে আসি আর মহানবী (সা.) যা বলেছেন– তাদেরকে সব খুলে বলি। অল্প কিছুক্ষণ পরেই আমি বেলালের ডাক শুনতে পাই, তিনি আবদুল্লাহ্ বিন কায়েস নাম ধরে ডাকছিলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দেই। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে যাও, তিনি তোমাকে ডাকছেন। এটি সেখানে কাউকে ডাকার রীতি ছিল। তখন তো লাউড স্পিকার ছিল না, তাই এভাবে ঘোষণা করা হতো। আমি যখন তাঁর (সা.) কাছে যাই তিনি (সা.) বলেন, এই কয়েক জোড়া উট নিয়ে যাও। আর এই কয়েক জোড়া উট অর্থাৎ ছয়টি উট তিনি (সা.) তখনই হযরত সা'দের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, যাও, এগুলো নিজ সঙ্গীদের কাছে নিয়ে যাও আর তাদের বলো, আল্লাহ্ (অথবা তিনি বলেছেন,) আল্লাহ্র রসূল (সা.) তোমাদেরকে এগুলো বাহন হিসেবে দিয়েছেন; এগুলোকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করো। অতএব আমি এই উটগুলো নিয়ে তাদের কাছে চলে যাই। আমি গিয়ে বললাম, মহানবী (সা.) এই উট তোমাদের আরোহণ করার জন্য দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে চড়তে দেবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন আমার সাথে সেই ব্যক্তির কাছে না যাচ্ছে, যে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সেই (কসম খাওয়ার) কথা শুনেছিল। পাছে তোমরা এটি ভেবে বসো, আমি নিজের পক্ষ থেকেই তোমাদেরকে

কোনো কথা বলে দিয়েছিলাম যা আদতে মহানবী (সা.) বলেন নি। তারা বলে, আমরা তো আপনাকে মন থেকে সত্যবাদী মনে করি। [কারণ প্রথমে তিনি বলেছিলেন, মহানবী (সা.) বাহন দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।] তিনি অত্যন্ত সতর্ক মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, তোমরা আবার এটা মনে করো না যে, প্রথমবার আমি নিজের পক্ষ কথা বলেছিলাম, আর কিছুক্ষণ পরেই উট নিয়ে এসেছি। যা বলেছিলাম, সেটিই প্রকৃত বিষয়। তোমাদের মাঝে এমন কেউ যদি থাকে যে তখন সেখানে উপস্থিত ছিল– তাকে ডাকো যেন সে আমার কথার সাক্ষী হয় যে, মহানবী (সা.) প্রথমবার এই উত্তরই দিয়েছিলেন; পরবর্তীতে উটের ব্যবস্থা হয়। যা-ই হোক, লোকেরা বলে, আমরা তো আপনাকে মন থেকেই সত্যবাদী মনে করি আর আমরা সেটাই করব যা আপনি পছন্দ করেন। হযরত আবু মূসা তাদের কয়েকজনকে নিয়ে সেসব মানুষের কাছে আসেন যারা মহানবী (সা.)-এর কথা, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর তাদেরকে উট দিতে অস্বীকৃতি জানানো এবং পরবর্তীতে তাদেরকে দেবার কথা শুনেছিল। তখন তারা তাদেরকে সেকথাই বলে যা হযরত আবু মূসা তাদেরকে বলেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর কসম খাওয়ার কারণ কী বা কসমের গুরুত্ব কী– এই বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি তফসীরে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি (রা.) লেখেন:

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, তাঁর (সা.) কাছে তো বাহন ছিলই না। তাহলে প্রশ্ন হলো, তিনি (সা.) কেন কসম খেয়ে বলেছিলেন, খোদার কসম! আমি তোমাদের বাহন দেবো না? পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাঁর (সা.) কাছে তখন কোনো বাহন ছিলই না। আর কসম খাওয়ার অর্থ হলো এমন কিছু থাকা সত্ত্বেও দিতে অস্বীকার করা। কেউ কি কখনো এই বলে শপথ করবে যে, আমি চাঁদে যাব না বা আমি সূর্যে যাব না? অথবা কেউ কি কসম খেয়ে বলতে পারে, আমি একবারে পুরো একটা হাতি গিলে ফেলব না? একইভাবে প্রশ্ন হলো, তাঁর (সা.) কাছে যেহেতু বাহনই ছিল না, সেক্ষেত্রে তিনি কেন শপথ করবেন? এর উত্তর হলো, অভদ্র ও শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকেরা ততক্ষণ অন্যের কথায় বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ সে শপথ না করে। আমার কাছে কখনো কখনো এমন লোকও আসে যারা বলে, আমাদের অমুক কাজটা করিয়ে দিন। আমি বলি, এ কাজ আমার সাধ্যের বাইরে। তখন তারা বলে, আপনি সব করতে পারেন! (তাদের ভাবটা এমন) যেন আমি কাজটি করতে পারি, কিন্তু মিথ্যা বলছি যে, পারি না। একইভাবে সেসব লোকও অভদ্র ও শিক্ষাদীক্ষাহীন ছিল। তারা সবে বয়আত করেছিল। আর মহানবী (সা.)-এর সত্যতা, মর্যাদা, মহত্ত্ব ও উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তিনি (সা.) যখন তাদেরকে বলেন যে, আমার কাছে কোনো বাহন নেই, তখন তারা ভেবেছিল, বাহন তো আছে, কিন্তু তিনি দিতে চাইছেন না। তাই তারা জোর দিয়ে বলে, আপনি তো বাদশা, আপনার কাছে বাহন না থাকার প্রশ্নই আসে না। উপরন্তু আরবদের স্বভাব ছিল, তারা কোনো কথায় ততক্ষণ আশ্বস্ত হয় না যতক্ষণ না কসম খাওয়া হয়। তারা সামান্য কথায়ও বলে ওঠে, ওয়াল্লাহে, বিল্লাহে, সুম্মা তাল্লাহে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম)। ফলে তাদের বাহন চাওয়ার একগুঁয়েমি থামানোর একমাত্র উপায় ছিল তাঁর (সা.) কসম খাওয়া। তারা যেহেতু তাঁর (সা.) উত্তরকে অজুহাত ও বাহানা মনে করেছিল, তাই তিনি (সা.) তাদেরকে আশ্বস্ত করতে এবং বিষয়ের ইতি টানার জন্য কসম খান। তারা চলে যায়। পরবর্তীতে যখন বাহন আসে তখন তিনি (সা.) তাদেরকে ডেকে বাহন প্রদান করেন। অতএব ঐ শপথের অর্থ ছিল– আমার সময় নষ্ট কোরো না। আর মহানবী (সা.)-এর এটি একটি অভিব্যক্তি ছিল মাত্র, মুখ থেকে তো আর উচ্চারণ করেন নি; কিন্তু প্রকাশভঙ্গি এমন ছিল যে, আমার সময় নষ্ট কোরো না

এবং পীড়াপীড়ি কোরো না। আর বাহন দেবার কারণ হলো, এটি পুণ্য অর্জনের একটি মোক্ষম সুযোগ এবং তিনি (সা.) এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চান নি।

সূরা আত-তাওবার ৯২ নম্বর আয়াত আমি পূর্বেও তিলাওয়াত করেছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ আয়াতের অধীনে বর্ণনা করেন,

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ

(সূরা তাওবা: ৯২)

“আর তাদের বিরুদ্ধেও (অভিযোগ) নাই, যারা তোমার কাছে এসেছিল যেন (জিহাদে যাবার জন্য) তুমি তাদের বাহনের ব্যবস্থা করে দাও। তুমি বলেছিলে, ‘আমি কিছুই পাচ্ছি না যাতে আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি।’ তারা এই দুঃখে অশ্রুসজল নয়নে ফিরে যায় যে, (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করার মতো তাদের কিছুই ছিল না।” এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, এ আয়াতটি প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য হলেও এখানে বিশেষভাবে সাতজন দরিদ্র সাহাবীর কথা বলা হয়েছে যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য অতি ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু হৃদয়ের এই বাসনা পূরণের সামর্থ্য তাদের ছিল না। তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে অনুরোধ করেন, আমাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। মহানবী (সা.) বলেন, দুঃখের বিষয় হলো, আমি কোনো ব্যবস্থা করতে পারছি না। এতে তারা গভীরভাবে ব্যথিত হন, চোখ অশ্রুসিক্ত হয় আর তারা ফিরে যান। তিনি (রা.) বলেন, তাদের চলে যাবার পর হযরত উসমান (রা.) তিনটি উট দেন আর অন্য মুসলমানরা চারটি (উট) দেন। মহানবী (সা.) প্রত্যেককে একটি করে উট দিয়ে দেন। কুরআন এ ঘটনাটি এজন্য উল্লেখ করেছে যেন এই দরিদ্র সাহাবীদের সত্যিকারের নিষ্ঠা তাদের বিপরীতে তুলে ধরা যায় যারা ধনী হওয়া সত্ত্বেও ও সফরে যাবার সামর্থ্যও থাকা সত্ত্বেও কিন্তু মিথ্যা অজুহাত খুঁজত। একদিকে দরিদ্রদের অবস্থা হলো তাদের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল, আবেগ-উচ্ছ্বাস ছিল এবং পূর্ণ ঈমান ছিল; অন্যদিকে ছিল সেসব সম্পদশালী লোক যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করত ঠিকই, কিন্তু কপটতায় পরিপূর্ণ ছিল। এই আয়াত থেকে এটিও বুঝা যায়, যারা মদীনায় রয়ে গিয়েছিল– তাদের সবাই মুনাফিক ছিল না; বরং কারো কারো কাছে (যুদ্ধের) উপকরণ না থাকায় পেছনে রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন; তাদের মাঝে এমন নিষ্ঠাবান মুসলমানও ছিলেন যারা কেবল যুদ্ধযাত্রার উপায়-উপকরণ না থাকার কারণে যেতে পারেন নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন:

আমরা সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করতে যাচ্ছি– মহানবী (সা.)-এর এই ঘোষণার পর মুসলমানরা নিষ্ঠা এবং আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করছিলেন। দরিদ্র মুসলমানরা যুদ্ধসামগ্রী কোথায় পাবে! তাদের কাছে কিছুই ছিল না। রাষ্ট্রীয় কোষাগারও তখন শূন্য ছিল। তাদের স্বচ্ছল ভাইয়েরাই কেবল তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারত। মোটকথা, প্রত্যেকে কুরবানীর ক্ষেত্রে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। হযরত উসমান (রা.) সেদিন তাঁর অর্থের বেশিরভাগ পরিমাণ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন, যা এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। [মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন বর্ণনা করেছিলেন তখনকার হিসেবে এর মূল্য ছিল পঁচিশ হাজার রুপি, আর বর্তমানে তো এর মূল্যমান লক্ষ লক্ষ টাকা হবে।] এভাবে সাহাবীরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা জমা করেন এবং দরিদ্র মুসলমানদের জন্য বাহন, তরবারি কিংবা বর্শা ইত্যাদি সরবরাহ করেন। সাহাবীদের মাঝে কুরবানীর স্পৃহা এত অধিক পরিমাণ ছিল যে, ইয়েমেনের কিছু লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেছিল এবং অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় ছিল, তাদের

কয়েকজন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদেরকেও আপনার সাথে নিয়ে চলুন। আমরা আর কিছুই চাই না। আমরা শুধু এতটুকু চাই যে, আমাদেরকে সেখানে পৌঁছানোর উপকরণ দেওয়া হোক। পবিত্র কুরআনে এসব লোক সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যেমনটি প্রথমে তিলাওয়াত করা হয়েছে যে,

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ

(সূরা তাওবা: ৯২)

অর্থাৎ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার জন্য তাদের কোনো পাপ হবে না। তারা তোমার নিকট এজন্য এসেছিল যেন তুমি তাদের জন্য এমন উপকরণের ব্যবস্থা করো যার সাহায্যে তারা সেখানে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু তুমি তাদের বলেছ, তোমাদের সেখানে পৌঁছে দেবার মতো কোনো উপকরণ আমার কাছে নেই। তখন তারা তোমার বৈঠক থেকে উঠে চলে যায় আর তাদের চোখ থেকে তখন এই কষ্টে অশ্রু ঝরছিল যে, হায়! তাদের কাছে কোনো সম্পদ নেই যা তারা ইসলামের সেবার জন্য ব্যয় করতে পারে। আবু মূসা তাদের নেতা ছিলেন। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনারা মহানবী (সা.)-এর নিকট তখন কী চেয়েছিলেন? তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা উট বা ঘোড়া চাই নি। আমরা শুধু বলেছিলাম, আমাদের পা খালি, আমাদের পায়ে জুতাও নেই। খালি পায়ে এত দীর্ঘ পথ আমাদের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। যদি শুধুমাত্র এক জোড়া জুতা আমাদের দেওয়া হতো, তাহলে আমরা জুতা পরে দৌড়ে দৌড়ে গিয়েই আমাদের ভাইদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পৌঁছে যেতাম। এতটা আন্তরিকতা ছিল তাদের!

এই যুদ্ধে যাবার সময় মদীনায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করা সম্পর্কে লেখা আছে, তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (সা.) মদীনায় কয়েকজন সাহাবীকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা বিদ্যমান। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) মদীনায় হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে তাঁর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়াও হযরত সিবাহ বিন উরফাতা (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-র নামও পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন এসব রেওয়ায়েতকে যদি সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়, অর্থাৎ কীভাবে এগুলোর মাঝে পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান করা যায়; চার ব্যক্তির নাম যে পাওয়া যায়– এসব বর্ণনা প্রকৃতপক্ষেই সত্য কিনা তা কীভাবে বুঝব? এর একটি উপায় হলো, এই চার ব্যক্তিকেই স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন ছিল। হযরত আলী (রা.)-র দায়িত্ব ছিল মহানবী (সা.)-এর পরিবারের দেখাশোনা করা। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ছিলেন মদীনাবাসীর সাধারণ বিষয়াদির দেখাশোনার দায়িত্বে। আর হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-র দায়িত্ব ছিল নামাযের ইমামতি করা। হযরত সিবাহ বিন উরফাতা (রা.)-কে প্রথমে মদীনার সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু এরপর হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে তার স্থলে মনোনীত করা হয়। যেহেতু এটি একটি দীর্ঘ যাত্রা ছিল, এজন্য মহানবী (সা.) তাঁর পরিবারের খোঁজখবর নেবার জন্য এবং তাঁর পরিবারের প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুনাফিকরা– যাদের একমাত্র কাজ ছিল ঠাট্টাবিদ্রুপ করা, তারা হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় রেখে যাবার কারণে তির্যক সমালোচনা করতে শুরু করে যে, (নাউযুবিল্লাহ্‌) তিনি (রা.) নাকি মহানবী (সা.)-এর জন্য বোঝা ছিলেন, যেকারণে তিনি (সা.) তাঁকে নিজের সাথে নেন নি। এসব বিদ্রুপাত্মক কথা শুনে অথবা চারপাশে মুনাফিকদের আচরণ দেখে হযরত আলী (রা.) স্বয়ং

বিচলিত হয়ে যুদ্ধাস্ত্রসহ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তখনো মদীনা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে জুরফ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। হযরত আলী (রা.) নিজের উদ্‌বেগ ও অস্বস্তির কথা উল্লেখ করে নিবেদন করেন, আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের মাঝে রেখে এসেছেন (অথচ) আমি শক্তিশালীও, (এবং যুদ্ধ করার) যোগ্যতাও রাখি। এতে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-র মনজয় করতে গিয়ে এমন একটি কথা বলেন যা হযরত আলী (রা.)-র মহত্ত্ব ও মর্যাদাকে পরম উন্নত মানে উপনীত করে। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي؟ অর্থাৎ হে আলী! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে আমার সেরূপ সম্পর্ক থাকবে যেমনটি ছিল হারূনের সাথে মূসার? কিন্তু (পার্থক্য হলো) আমার পরে তুমি নবী নও। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) যখন তূর পর্বতে আরোহণ করেন, তখন তাঁর অবর্তমানে হারূন (আ.) ছিলেন হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত, তিনি নবীও ছিলেন। তুমিও আমার স্থলাভিষিক্ত হবে, কিন্তু তুমি নবী হবে না।

তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে, মহানবী (সা.) যুদ্ধের বাহ্যিক সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং প্রস্তুতির শুরু থেকে তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করা পর্যন্ত এই দোয়া করতে থাকেন,

اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! যদি এই ছোট্ট দলটি (আজ) ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না। এটি একটি অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা যে, মহানবী (সা.)-এর প্রথম যুদ্ধাভিযান, অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং তাঁর (সা.) জীবনের শেষ যুদ্ধাভিযানের প্রাক্কালেও এই একই দোয়া করার উল্লেখ পাওয়া যায়। যাহোক, প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে দীর্ঘ যাত্রা এবং অন্যান্য অনেক সমস্যা আর মুনাফিকদের অপপ্রচার সত্ত্বেও ত্রিশ হাজারের একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এতে দশ হাজার অশ্বারোহী ছিল। মহানবী (সা.)-এর জীবনের অন্যান্য সকল যুদ্ধাভিযানের তুলনায় এটি ছিল বৃহত্তম সৈন্যবাহিনী। সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করা হয়েছে। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী চল্লিশ হাজার এবং অপর এক রেওয়ায়েতে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ৭০ হাজারও উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর সাথে দশ হাজার ঘোড়া ছিল, অথবা কারো কারো মতে বারো হাজার ঘোড়া ছিল। ত্রিশ হাজার সংখ্যাতেই ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই ত্রিশ হাজার সংখ্যাটিকে সঠিক বলেছেন। আর এটি একটি অনুমান মাত্র, কেননা সেই সময় মুজাহিদদের গণনার জন্য কোনো রেজিস্টার বা রেকর্ড বই ইত্যাদি কিছু ছিল না, যেমনটি খিলাফতে রাশেদার যুগে এই (মুজাহিদদের গণনার জন্য রেজিস্টার খাতার) ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) আনসার এবং আরব গোত্রগুলোকে **'লিওয়া'** অর্থাৎ ছোটো পতাকা কিংবা **'রায়া'** তথা বড়ো পতাকা বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) তাবুকের যুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো পতাকা হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রদান করেন। এছাড়াও হযরত যুবায়ের, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের, হযরত আবু দুজানা অথবা কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.)-কে ছোটো পতাকা প্রদান করা হয়েছিল।

সেই যুগে কোনো কাফেলা বের হবার সময় কোনো না কোনো গাইড অবশ্যই সাথে রাখা হতো যারা রাস্তা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানত। এই গাইড নির্ধারণ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে, তাবুকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) গাইড হিসেবে আলকামা বিন ফাগওয়া

খুযায়ী এবং তার পিতাকে মনোনীত করেছিলেন, যারা রাস্তা সম্পর্কে খুবই ভালোভাবে জ্ঞাত ছিলেন আর সঠিক পথে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারতেন। হযরত কা'ব বিন মালিক বর্ণনা করেন, তাবুকের যুদ্ধের জন্য মহানবী (সা.) বৃহস্পতিবার যাত্রা করেন এবং তিনি (সা.) বৃহস্পতিবার সফর করা পছন্দ করতেন। সাধারণ রীতি আনুযায়ী মদীনা থেকে অল্প দূরত্বে সানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে লোকেরা সমবেত হতে থাকে, আর সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা থেকে তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলও তার মুনাফিকীর শেষ অস্ত্র হিসেবে একটি সৈন্যদল নিয়ে সানিয়াতুল বিদার নীচের দিকে **যুবা** পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করেছিল। সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে, সেও মুসলমানদের সাথে তাবুকের যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মহানবী (সা.) সৈন্যবাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিতেই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এ কথা বলে নিজের সৈন্যদলসহ মদীনায় ফেরত চলে আসে– এই মুসলমানরা রোমানদের সাথে যুদ্ধকে ছেলেখেলা ভাবছে! এই কথা বলে সে ফেরত চলে যায় যে, এটা কোনো ছেলেখেলা নয়; রোমান সাম্রাজ্য একটি বিশাল সাম্রাজ্য! এটিও বলা হয় যে, তার সৈন্যদল বেশ বড়ো ছিল। সে বলে, এত প্রচণ্ড গরম এবং এমন পরিস্থিতে এত দূরের সফর কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে বলতে থাকে, আমি তো মুহাম্মদ (সা.)-র সাথিদেরকে রোমানদের হাতে বন্দি হতে দেখতে পাচ্ছি। এ কথা বলে সে ফেরত চলে যায় আর (তার) উদ্দেশ্য ছিল– হয়ত এতে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে পড়বে, আর তার ধারণা অনুসারে হয়ত কিছু মুসলমান মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। কিন্তু সে চিরাচরিতভাবে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়েই ফেরত গিয়েছে। সে উহুদের যুদ্ধেও এমনটি করেছিল। তখনও সে মুসলিম বাহিনীর সাথে খানিকটা পথ গিয়েছিল, অতঃপর পথিমধ্যে তার তিনশ সাথিকে নিয়ে ফেরত চলে গিয়েছিল। যদিও মুসলিম সেনাদলের সর্বমোট সংখ্যা ছিল এক হাজার আর এরপর (শুধুমাত্র) সাতশ রয়ে গিয়েছিলেন। আর এটি (তথা তাবুকের যুদ্ধের মুসলিম বাহিনী) তো অনেক বড়ো সেনাবাহিনী ছিল।

যাহোক, এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য এসে পড়ে। মহানবী (সা.) এই বিষয়টি জানতে পেরে (মনিবের) অনুমতি ছাড়া অংশগ্রহণকারী দাসকে ভর্ৎসনা করেন। এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, মহানবী (সা.) সানিয়াতুল বিদায় শিবিরে অবস্থানকালে একজন সশস্ত্র দাসকে দেখতে পান, যে তার (মহিলা) মনিবের অনুমতি ছাড়াই চলে এসেছিল। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি তোমার (মহিলা) মনিবের কাছে ফেরত চলে যাও। [তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, অনুমতি নিয়েছ? সে বলে, জি না; তিনি (সা.) বলেন, ফেরত চলে যাও।] মহানবী (সা.) আরো বলেন, আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কোরো না। তুমি যদি যুদ্ধে মারা যাও তবে জাহান্নামে যাবে, [অর্থাৎ তোমার ঈমানের দাবি হলো, মনিবের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।] যাহোক, এই যুদ্ধের অবশিষ্ট বিবরণ আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

এখন কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণও করতে চাই যাদের জানাযার নামায পরবর্তীতে পড়াবো। প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে জনাব গোলাম মুহীউদ্দীন সুলায়মান সাহেবের যিনি ইন্দোনেশিয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ্ ছিলেন। তিনি সম্প্রতি সাতষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৩২ সালে তার দাদা হাজী দামিনী সাহেব মওলানা রহমত আলী সাহেবের হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। মরহুম প্রাথমিক পড়ালেখা শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য রাবওয়ায় চলে যান এবং সেখানে তিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার ফাসলুল খাস-এ ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৮৫ সালের জুলাই

মাসে তিনি সেখান থেকে শাহাদাতুল আজানিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে যান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি (রাহে.) তাকে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা ও সেখানকার বিভিন্ন শহরে নিযুক্তি প্রদান করেন আর তিনি আঞ্চলিক মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করতে থাকেন। অনুরূপভাবে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিসমূহেরও সদস্য ছিলেন। তিনি মোটামুটি চল্লিশ বছর কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই পুত্র ও এক কন্যা রয়েছেন।

তার এক পুত্র মুসলেহ্ উদ্দীন এহসান সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং তিনিও সেখানেই সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। তার সব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তার সম্পর্কে এ কথাগুলো বলেছেন যে, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সাদাসিধে ও খুবই বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলেন। নিজ জীবন সর্বদা ধর্মের সেবা, আহমদীয়া জামা'ত ও অন্যের হিতসাধনের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। তার মাঝে খুবই উন্নতমানের বিনয়, নম্রতা ও নিয়মানুবর্তিতার বৈশিষ্ট্য ছিল। তার সাথে যে-ই মিশতেন তিনিই তার নিষ্ঠা, সাদাসিধে ব্যবহারে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারতেন না। তালীম ও তরবিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে তার সেবাসমূহ উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্বদা জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিকতাকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং সর্বদা এ বিষয়ে চিন্তিত থাকতেন যে, নতুন প্রজন্মকে উত্তম চরিত্র ও ঈমানে সুসজ্জিত করা উচিত। তবলীগের কাজেও তিনি মনেপ্রাণে ভূমিকা রেখেছেন এবং সর্বদা নিষ্ঠা, গাম্ভীর্য ও ভালোবাসার সাথে নিজ বাণী পৌঁছিয়েছেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। তার বিশ্বস্ততা অনুকরণীয় ছিল। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী একজন মানুষ ছিলেন। অন্তিম দিনগুলোতে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। অসুস্থ অবস্থায় কোনো অভিযোগ-অনুযোগ তার মুখে উচ্চারিত হয় নি, বরং সর্বদা কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা ও স্মৃতিচারণ জনাব ড. মুহাম্মদ শফিক সেহগাল সাহেবের। তিনি মুলতানের জেলা আমীরও ছিলেন, পরবর্তীতে রাবওয়ায় তাহরীকে জাদীদের সহকারী ওয়াকীলুত্ তাসনীফ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে তিন পুত্রসন্তান রেখে গেছেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার পিতা জনাব মরহুম মিয়াঁ মুহাম্মদ উমর সেহগাল সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল যিনি দ্বিতীয় খলীফার যুগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন পিএইচডি ডক্টর ছিলেন। তিনি মেট্রিক পাশ করার পর জীবন উৎসর্গ করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র নিকট নিজেকে উপস্থাপন করেন। খলীফা সানী (রা.) তাকে বলেন, শিক্ষা অর্জন করো। সে-সময় ফযলে উমর রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ করার পরিকল্পনা চলছিল। যাহোক, তার বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করার আগ্রহ ছিল। তিনি প্রথমে রসায়নবিদ্যায় এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাজ্য থেকে রসায়বিদ্যায় পিএইচডি করেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এক শিক্ষকের ছাত্র হবার সম্মানে তিনি সম্মানিত ছিলেন। যাহোক, যখন তিনি চলে আসেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে তো রিসার্চ ইন্সটিটিউট নির্মিত হতে পারে নি, এজন্য হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে সেখানে কাজে লাগান নি এবং তার অবসর সময়ই কাটছিল। তখন তার পিতা বলেন, যতদিন তিনি জামা'তের কাজে লাগছেন না ততদিন তাকে আমার সাথে ব্যাবসায় সাহায্য করার অনুমতি প্রদান করুন। সুতরাং তিনি তার পিতার সাথে ব্যাবসায় অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু এর পাশাপাশি বিভিন্ন ভাবে জামা'তের সেবা করারও তার সুযোগ হয়েছিল। প্রায় চৌদ্দ থেকে

পনেরো বছর মুলতানের জেলা আমীর হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। এভাবে তিনি ফুরকান ফোর্সেও অংশগ্রহণ করেন। খলীফতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র যুগে কোলকাতায় দুটি পরিবারের মধ্যে দীর্ঘ বিবাদ চলে আসছিল আর তারা তার আত্মীয়ও ছিল। তখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে তাকে একটি তদন্ত কমিশনের দায়িত্ব দিয়ে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই সমস্যার সমাধান করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমি জানি, আপনি আত্মীয়তার ঊর্ধ্বে থেকে সততার সাথে সিদ্ধান্ত দেবেন। বাস্তবে পরবর্তীতে এমনটিই হয়েছে। ১৯৯১ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে-র নির্দেশে তিনি উগান্ডায় একটি তেলের মিল স্থাপনের কাজে যান এবং নিজ তত্ত্বাবধানে সেখানে তেলের মিল স্থাপন করেন। এভাবে আফ্রিকার আরো তিনটি দেশে এবং ইউরোপের একটি দেশে তাকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয় যা তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। মুলতানে তার অনেক বড়ো ভোজ্য তেলের কারখানা ছিল। নিজের ব্যবসা করলেও তার মধ্যে সর্বদা এই চেতনাবোধ জাগ্রত ছিল যে, আমি একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী; আর তিনি নিজ ব্যাবসাবাণিজ্যের ব্যস্ততাকেও জামা'তের কাজের স্বার্থে গৌণ বিষয় হিসেবে দেখতেন। যাহোক, ২০০৩ সালে তিনি আমাকে লেখেন, এখন আমি ওয়াকফ করতে চাই, অবশিষ্ট জীবন সেবা করতে চাই। সুতরাং আমি তাকে তাহরীকে জাদীদের সহকারী ওয়াকীলুত্ তাসনীফ হিসেবে নিযুক্ত করি। তিনি শিক্ষিত ছিলেন, তার ইংরেজীও ভালো ছিল এবং ধর্মীয় জ্ঞানও রাখতেন, তাই সেই দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। তার ছেলে মাহমুদ সেহগাল সাহেব লেখেন, তিনি একটি কর্মময়, সার্থক ও ইবাদতে সজ্জিত জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ করেছেন। কুরআন করীম পাঠ এবং কুরআনের বিষয়সমূহের ওপর প্রণিধান করা তার একটি বিশেষ গুণ ছিল। তার মৃত্যুতে অধিকাংশ সমবেদনা প্রকাশকারীরা এই মন্তব্য করেছেন যে, তার প্রকৃতিতে কোমলতা ছিল আর তিনি ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, স্নেহপরায়ণ একজন মানুষ ছিলেন। তার পরামর্শ ও তরবিয়তের রীতি ছিল খুবই সুন্দর। তিনি বলেন, আমাদেরকেও সর্বদা জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্যের জন্য উপদেশ দিতেন আর বলতেন, যদি সংশোধনীয় কোনো বিষয় দেখতে পাও তবে নিজেদের মতামত শুধু উপযুক্ত স্থানেই প্রদান করবে, যত্রতত্র কথা বলবে না। সবসময় বলতেন, তোমরা অন্যদের দিকে দেখো না, কর্মকর্তাদের দিকে দেখো না। তোমরা যুগ-খলীফার হাতে বয়আত করেছ। সুতরাং এই কথা মনে রেখো, আমরা যে কাজই করি না কেন– তা যুগ-খলীফার অনুসরণে করব আর তাঁর সাথে কৃত বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হচ্ছে শ্রদ্ধেয়া বুশরা পারভেজ মিনহাজ সাহেবার। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পারভেজ মিনহাজ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি করীম নগর নুসরাতাবাদে জামা'তের যে ফার্ম ছিল– সেটির প্রাক্তন ম্যানেজার চৌধুরী ফযল আহমদ সাহেবের মেয়ে ছিলেন আর বিয়ের পূর্বেও তিনি হায়দ্রাবাদের সিন্ধুতে লাজনা ইমাইল্লাহ্র অনেক সেবা করেছেন। এরপর তিনি যখন রাওয়ালপিন্ডিতে ছিলেন, সেখানেও তিনি সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন এবং হায়দ্রাবাদ পিন্ডিতে লাজনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি যখন স্বামীর সাথে আমেরিকা চলে যান তখন সেখানেও নিজ মজলিসে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি নামায-রোযায় নিয়মিত ছিলেন, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, আল্লাহ্র ওপর ভরসাকারী,

খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী, অতিথিপরায়ণ, মিশুক স্বভাবের, মানুষের হিতসাধনকারী, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল অত্যন্ত পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাসম্পন্ন একজন মহিলা ছিলেন। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং নিয়মিত আর্থিক কুরবানীতে সর্বদা অগ্রসর থাকতেন। খিলাফতের সাথে তার দৃঢ় সম্পর্ক ছিল। আমাকে নিয়মিত দোয়ার জন্য চিঠিও লিখতেন। মরহুমা একজন মূসিয়া ছিলেন। তার কোনো সন্তান ছিল না, কিন্তু অন্যদের সন্তানের প্রতি অনেক ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)